ত্রৈমাসিক অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা

পঁচিশ বর্ষ, দ্বিতীয় অনলাইন সংখ্যা,
এপ্রিল – মে ২০২২, বৈশাখী ১৪২৯

আপনারা জানেন **চিত্রোক্তি** - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ সাল। কবি-সম্পাদক-গল্পকার শ্রী অমল করের একান্ত সহযোগিতা এবং সাহচর্যে চিত্রোক্তির পথ চলা শুরু হয়েছিল। ক্রমাগত নয়টি মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশ পাবার পরে বিভিন্ন কারণে এটি অনিয়মিত হয়ে পড়ে। যদিও চিত্রোক্তি পত্রিকা সামাজিক কাজকর্ম থেকে বা সাহিত্য থেকে কখনই বিচ্যুত হয়নি। এখন আবার নব কলেবরে অনলাইনে পুনরায় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আশাকরি এই দ্বিতীয় সংখ্যাটিও সকলের ভালো লাগবে প্রথম সংখ্যার মতই।

মহামারি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে তার মতো করে। তার মধ্যেই আবার রাশিয়া ইউক্রেন অযাচিত যুদ্ধ। এই ধ্বংস ও ধসের সময়ে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ মনে হয় সাহিত্য। "চিত্রোক্তি" অনলাইন পত্রিকার এই নতুন পদক্ষেপ সেই প্রতিরোধকে আরও শক্ত করবে আশা রাখি।

সম্পাদক: শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রধান উপদেষ্টা: অমল কর
যুগ্ম-সম্পাদক: সম্রাট পাত্র, অরবিন্দ সাঁতরা

প্রচ্ছদ – গার্গী চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর

"চিত্রোক্তি"
সম্পাদক - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
"আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট"
বোস পাড়া রোড,
বড়িশা পূর্ব পোস্ট,
কলকাতা - ৭০০০০৮

Email: write@chitroktipotrika.org
WhatsApp: 8297976134

www.chitroktipotrika.org

CHITROKTI POTRIKA

লেখক সূচি

কবিতা

- আশিস সান্যাল - দিনের সাঁতার শেষে : 07
- তরুণ মুখোপাধ্যায় - হত্যার বিরুদ্ধে : 07
- অমল কর - আর কবে : 08
- সাতকর্ণী ঘোষ - দুচোখের অন্বেষণ : 08
- ঝুমা সরকার - যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদে : 09
- দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায় - যুদ্ধ নয় : 09
- বীথি কর - আঁতুড়-ঘর : 10
- পল্লব চট্টোপাধ্যায় – রাস্তা : 10
- শোভন বিশ্বাস - প্রেরণার আশ্বাস : 10
- সৈকত নায়েক - সংশোধনের শব : 11
- সুব্রত দেব - একা একা : 11
- তীর্থংকর সুমিত – পথ : 11
- অর্পিতা – স্বপ্ন : 12
- অনসূয়া দত্ত - ভাষাহীন গল্প : 12
- স্বর্ণেন্দু সরকার – অ্যামিবা : 13
- সাগর শর্মা- বিজ্ঞানমনস্কদের প্রতি : 13
- মনোজকুমার মণ্ডল - অবেলায় ভিজি : 14
- সৌম্যজিত ঘোষ - ভালো থেক প্রিয় : 14
- কাশীনাথ সাহা – স্বপ্নময় : 15
- দেবাশিস সরখেল - আক্ষেপ : 15
- প্রতীক মিত্র – এখনও ইচ্ছেগুলো : 15
- দেবব্রয়ী হালদার – উড়োচিঠি : 16
- রেজাউল করিম রোমেল – সময় : 16
- বলাই দাস - সেকথা তোমাকে বলা হয়নি : 17
- শুকদেব দে - আলাদা মিল : 17
- রথীন পার্থ মণ্ডল - নিঝুম রাতের কান্না : 18
- উদয়ন চক্রবর্তী - অধঃপতন : 18
- মনিরুজ্জামান প্রমউখ - স্বাধীনতা মোহনা : 19
- বিশ্বজিত্ রায়চৌধরী - প্রেম : 19

CHITROKTI POTRIKA

- শুভ্রকান্তি ভট্টাচার্য - বেরঙিন : 19
- শুভদীপ দত্ত প্রামাণিক – অর্ধচন্দ্র : 20
- সুদীপ্ত বিশ্বাস – বাউল : 20
- গাজী আবু হানিফ - পথ : 20
- অম্লান বাগচী – বন্ধন : 21
- নীলম সামন্ত - ধর্ম বলে কিছু নেই : 21
- নীলাঞ্জন কুমার - বন্ধুবৎসল : 22
- মহাজীস মণ্ডল - প্রেমের কাহিনি : 22
- দেবযানী মহাপাত্র - গোড়ার কথা : 22
- তাপস বন্দোপাধ্যায় - প্রস্থানপর্বের ভাষায় : 23
- গোপেন মণ্ডল - গোধূলিবেলা সাঁঝের বেলা : 23
- কবিতা ধর - আমরা আগামী : 23

ছড়া

- বিপুলকুমার ঘোষ - হারিয়ে গেছে শৈশব : 24
- শ্রীকান্ত মাহাত - বায়না : 24
- হারানচন্দ্র মিস্ত্রী - এল বসন্ত : 24

গল্প

- ভবানীশংকর চক্রবর্তী - তছনছ : 25
- বনানী শিকদার – বন্ধুবিহঙ্গ : 25
- মঞ্জুশ্রী মণ্ডল - লড়াই : 27
- কাশীনাথ সাহা – পরম্পরা : 29
- অসিতকুমার পাল - সিদ্ধান্ত পরিবর্তন : 29

গ্রন্থ আলোচনা

- ভবানীশংকর চক্রবর্তী - কবিতার স্বরান্তর (ভেঙে যাচ্ছে চাঁদ - অমল কর) : 31

ছোটোদের বিভাগ - আঁকিবুকি

- গার্গী চট্টোপাধ্যায় – নবম শ্রেণি : 32

CHITROKTI POTRIKA

কিছু কথা

যুদ্ধ আসলে কখনোই শান্তি বয়ে নিয়ে আসে না । যুদ্ধে সবসময়ই নিরপরাধ মানুষ আক্রান্ত হন বিশেষ করে নারী ও শিশুরা যুদ্ধের নিশংসতার শিকার হয়। দুর্বলের উপর আক্রমণ - গণহত্যা - খুন ইত্যাদি পৃথিবীর জঘন্যতম কাজের মধ্যে অন্যতম ।

বাইবেলে বলা আছে "খুন কোরো না, কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হলে পর সেখানে কিভাবে এই আদেশটি প্রয়োগ করা যাবে তার খোঁজ করতেই থাকি আমরা । যাইহোক, হিব্রু শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "হিংসাবশত পুর্বপরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে মেরে ফেলাই হচ্ছে খুন বা হত্যা।" প্রায়ই ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের আদেশ মত অন্য জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধ করতো। বড় বড় অপরাধের জন্য ঈশ্বর মৃত্যুদন্ডের বিধান করেছিলেন । ঈশ্বর হত্যা বা খুন করার জন্য মৃত্যুদন্ড দেওয়ার বিপক্ষে নন। যুদ্ধ কখনই ভাল কোন বিষয় হতে পারে না, কিন্তু কখনও কখনও এটির দরকার হয়ে পড়ে। ধর্মগ্রন্থ বলে পৃথিবী পাপীতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অথবা কখনও কখনও নির্দোষ কোন লোকদের পাপপূর্ণ লোকদের সাধিত বিরাট কোন ক্ষতিসাধনের হাত থেকে রক্ষা করতে যুদ্ধ করাই একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়।

আসলে ঈশ্বরই হোন বা বুদ্ধিজীবী মানুষ, কখনই যুদ্ধ সমর্থন করেন না কেউই । কিন্তু যুদ্ধ লাগলে দোষিকে সাজা পেতেই হয় আজ নয়ত কাল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি হিটলার পরাজিত না হতেন তাহলে কী আরও লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা হতো না? যদি আমেরিকাতে বেসামরিক যুদ্ধ না হতো তাহলে কী আরও অধিক সংখ্যক আফ্রো-আমেরিকানদের ক্রীতদাস হিসাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হতো না?

যুদ্ধবিশেষজ্ঞরা যুদ্ধকে মানব প্রবৃত্তির সার্বজনীন এবং আদিম চরিত্র হিসাবে বিবেচনা করলেও, কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষ একে নির্দিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত পরিস্থিতির ফলাফল বলেও মনে করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একই পরিবারের উদ্‌ভূত পাণ্ডব ও কৌরব শিবিরের মধ্যে। এই যুদ্ধের বাণী হলো ধর্মের জয় ও অধর্মের বিনাশ। পাণ্ডবরা ন্যায়, কর্তব্য ও ধর্মের পক্ষ। অন্যদিকে কৌরবরা অন্যায়, জোর-জবরধস্তি ও অধর্মের পক্ষ।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লরেন্স এইচ. কিলে তাঁর ওয়ার বিফোর সিভিলাইজেশন বইতে বলেছেন, ইতিহাসের পরিচিত সমাজগুলোর প্রায় ৯০-৯৫% অনিয়মিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং অনেকে নিয়মিত যুদ্ধও করত বিভিন্ন কারণে।

আমরা ক্রমাগত লক্ষ্য করছি রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর নিজস্ব এক ভুবনে আটকা পড়ে আছেন। আসলে তিনি তাঁর নিজের তৈরি একটি বুদবুদের মধ্যে বসবাস করছেন। আসলে বাইরে থেকে প্রকৃত তথ্য অনেক সময়েই তাঁর কাছে পৌঁছায় না। বিশেষভাবে তাঁর নিজের মতামতের বিরুদ্ধে কোন কথা কেউ বলেও না।

যুদ্ধ সব সময়ই একটি ভয়ঙ্কর বিষয়। যুদ্ধ কখনও সঠিক সমাধান হতে পারে না। অতীতেও কখনো হয়নি। বরং একটি যুদ্ধ ভবিষ্যতে জন্ম দেবে আরও অনেক যুদ্ধের। এতে ধ্বংস হবে সাধারণ মানুষ। আর যারা যুদ্ধের জন্য দায়ী, তারা কেবল বসে থেকে মানুষের লাশ গুনবে, ওদের কিছুই হবে না হয়তো। সুতরাং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানই হোল একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায়।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক – চিত্রোক্তি

CHITROKTI PATRIKA

কবিতা

আশিস সান্যাল

দিনের সাঁতার শেষে

দিনের সাঁতার শেষে সন্ধ্যা নামে
অবসাদে ভরে যায় মন।
এখন কোথায় তুমি নিবেদিতা?
মনে পড়ে একদিন আমরা দুজন
নিশ্চিন্দাবনের পাশে অমেয় নির্জনে
ছিলাম নির্ভয়ে বসে যেন আনমনে।
আজ তুমি কোন্ খানে নিবেদিতা রায়?
আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে এখন কোথায়?

এখন ফাগুন মাস,
বসন্তের বনে
ওড়ে নীল প্রজাপতি
তারাভরা আকাশের উত্তর-দক্ষিণে
সাদা মেঘ উড়ে যায়
যুবতি চাঁদের আলো
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যেন রিমঝিম
শতাব্দী অতীত হয়
যুগ থেকে যুগান্তরে
ঝরে শুধু হিম।

তরুণ মুখোপাধ্যায়

হত্যার বিরুদ্ধে

বোমারু বিমান আর ড্রোন উড়ে যাচ্ছে
জনপদ জ্বলছে বোমার আগুনে,
সৈনিকের মুখে পৈশাচিক হাসি;
আঃ, এই তবে যুদ্ধ?
কিন্তু কীসের জন্য? কাকে মারছো তোমরা?
ওরাও মানুষ; ওরা কারো বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু
এবং তোমারও স্বজন; তবে কেন এমন সন্ত্রাস?

এ-পৃথিবী হিংসা-দ্বেষে ভরা নয়; মৈত্রী-প্রীতি যত
মানুষের জন্য । ভুলে গেলে ভালোবাসা কী মধুর?
এত হত্যা, এত রক্ত, ক্ষমতার দম্ভ ভালো লাগে?
জয়, জয় কাকে বলো? ঘৃণা নিয়ে বেঁচে থাকা সুখ নয়।
তাহলে মানুষ বুঝি আজ আনুপূর্বিক জন্তু মাত্র _
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত?

তুমি কী সত্যিই লজ্জা পাও, হে সভ্য মানুষ?

CHITROKTI POTRIKA

অমল কর

আর কবে

শোষণের চিৎকারে
পাকস্থলীর ক্রোধ নেই যার
কী দিয়ে মস্তিষ্ক তার?

বিনাশী বারুদে কাঁপিয়ে দিচ্ছে
প্রবল বসত, বসতের মাটি
ভিটেমাটি চাঁটি করে চরছে ঘুঘু
যে হৃদয় ছোঁয় হাপরের গান
তারই চিহ্ন আঁকা হয়ে যায়
কলের ভেঁপুতে

বলো, কী দিয়ে সৃষ্ট তোমার কলিজা
চারিদিকে তিতিরের মতো অন্ধকার
শোষণ লুন্ঠন হনন ধর্ষণ নৈরাজ্য_
তুমি ভেজা বারুদের মতো চুপ থাকো
কবে, বলো, কবে তুমি
কুলোর মতো বিকিয়ে ওঠবে
প্রতিস্পর্ধী প্রতিবাদে প্রতিরোধে
তুমি কবে আছড়ে পড়বে
কবে তুমি গর্জে ওঠে
অধিকার ছিনিয়ে আনবে?

সাতকর্ণী ঘোষ

দুচোখের অন্বেষণ

বিপ্লবের মা-কে চশমা পরতে দেখলে
আমার ছোটোপিসি সামনে এসে দাঁড়ায়
অবিকল তাকে ছোটোপিসি মনে করে
আমার মনের বোতাম খুলতে থাকে
হারিয়ে যাই বিপ্লবের মায়ের মধ্যে
আবার বিপ্লবও কখনও কখনও
আমার ছোটোমামা হয়ে যায়
আমি ছোটো হয়ে মামাকে পেতে চাই
এইসব কতকিছু ঘটে ঠিক-ভুলের যাপনচিত্রে
কিন্তু কারো মুখের মধ্যে আমার ছোটদিকে পাইনা
খুঁজি সেই মুখ মায়াময় ভালোবাসার মুখ
তন্নতন্ন করে বিশ্বনিখিল খুঁজি
জনারণ্যে যাই পাহাড়ে যাই সমতলে নামি
চড়াই উৎরাই ভাঙি ভেঙে ফেলি নিজেকেও
অথচ কারো মধ্যেই ছোটদি ফুটে ওঠেনা
ছোটোপিসি এসে দাঁড়ায় ছোটমামাও এসে দাঁড়ায়
কখনও আবার অস্পষ্ট ঠাকুমা ধরা দেয় কারোর মধ্যে
আমি বিপ্লবের মাকে তার মা না ভেবে আমার ছোটোপিসি ভাবি
বিপ্লবকে ছোটোমামা আর অনেকের মধ্যে ঠাকুমাকে
সবাই যখন হইহই করে আনন্দ করি
তখন সেই আনন্দ সায়রে
বিপ্লব খুঁজে পায় আমার ছোটদিকে
আমি দিশাহীন খুঁজতে থাকি-
খুঁজতে খুঁজতে দেখি
আমারই মুখের মধ্যে আমারই ছোটদি মিটিমিটি হাসছে

CHITROKTI

ঝুমা সরকার

যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদে

ইউক্রেনের বাতাসে আজ বিষাক্ত বারুদের গন্ধ,
ইতিহাসের পাতায় আবারও এক ধ্বংসের কাহিনি
যুদ্ধবাজেরা অতন্দ্র যুদ্ধের আয়োজনে রোজ।
আক্রমণ আর প্রতিরোধ এই দুইয়ের মাঝে
কত কি ধ্বংস হয়ে গেল
তবুও যুদ্ধ চলছেই।

নির্বিবাদে অসহায় মানুষের মৃত্যু দেখছে পৃথিবী
ওরাও তো বাঁচতেই চেয়েছিল
তবুও অনাবশ্যক মৃত্যুর হাতছানি
ছিনিয়ে নিল এক-একটা তাজা প্রাণ।
ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে শশ্মানের নীরবতা,
যেন এক পৌরাণিক অভিশপ্ত নগর
তার মালিন্য হারিয়ে বিবর্ণ- ধূসর
ক্ষতবিক্ষত ইতিহাসের অপেক্ষায়।

লাভক্ষতি কার কতটা হয়েছে
সেটা সময় বলবে
তবে আমরা আর কতদিন
শুধু দর্শক হয়ে বাঁচব
করুণ স্মৃতি আর হাহাকার সম্বল করে?
যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদের শব্দের মিছিলে
গর্জে ওঠুক এবার সমগ্র পৃথিবী
যুদ্ধ নয় ফিরুক শান্তির আলো ঘরে ঘরে।

দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায়

যুদ্ধ নয়

সাজো সাজো রণসাজে, সেজেছে সৈনিক,
খবরের ছয়লাপে ভরেছে দৈনিক।
বোমারুর বোমাতে মরে যে জনগণ
পুতিনের হুংকারে জ্বলন্ত মহারণ।
চেতনার চৈতন্য হয় ডুবন্ত ডিঙি
যুদ্ধের দামামা বাজে বাজে বুঝি সিঙি।
হৃদয়ের পালে হাওয়া যায় আর আসে,
যুদ্ধ আর শান্তি থাকে ঠিক পাশে পাশে।

অসুর দমনে যুদ্ধ করে মহামায়া
তাঁর আছে মায়াভরা আঁচলের ছায়া।
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা হয় রাজা রাণী মাতে,
ক্ষিদে পায় খোকাখুকু, চায় ফাঁকা পাতে
অসুর বৃত্তি ভুলে গাও সুরের জয়,
শান্তির আঁচলে থাকো, কোনো যুদ্ধ নয়।

CHITROKTI POTRIKA

বীথি কর

আঁতুড়-ঘর

সহজ কথা সহজ তো নয় বলা,
সামনে এসে দাঁড়ায় যদি সে।
বিচ্ছিন্ন অভিযোগের খাতায়,
অসংখ্য পাতা ছিঁড়েছি অচিরেই।

বসন্তের ঘণ্টা বাজে গ্রীষ্মের আগমনে,
ঢালাই করা পিচ রাস্তা গলতে শুরু করে।
যেমন ভাবে গলেছে সুখ মিথ্যে অহংকারে,
নাভিশ্বাস উঠেছে বুকে অদম্য চাওয়ার ভারে।

বন্ধু তুমি স্বপ্ন দেখাও অবাক পৃথিবীর,
নীলের পড়ে নীল জমেছে কিন্তু সাংঘাতিক।
গোপন ঘড়ির শব্দে আলতো হাতে ছোঁয়া,
বিচ্ছিন্নটা সহজ তাই ভনিতা সাময়িক।

বন্ধু তুমি বন্ধু থাক গোপন ঘরে চাবি,
দূরপাল্লার ট্রেনের শব্দ স্বপ্ন বেমানান।
যুদ্ধ চলে অসীম ছোঁয়ায় চোখ দেখতে বারণ,
সবটা যদি বুঝে যাও আমার ছোঁয়া সমান।

হাত ধরেছি, মন ছুঁয়েছি, আতুর ঘরে খিল,
আকাশ জুড়ে ভাসে জন্মের আকুল চিৎকার,
দু-জন মানুষ মিল খুঁজে নেয় প্রেমের ভনিতায়,
আসলে দগ্ধ গরম ভুলিয়ে দেয় শীতের শিৎকার।

শোভন বিশ্বাস

প্রেরণার আশ্বাস

সামনে ঝাপসা আলো
পেছনে মসিকালো মেঘ
ক্রূর এই সময়ে ভালোবাসার
বড়ো অনটন
চারিদিকে রুদ্ধ সুবাতাস
স্বপ্নহীন বালুচরে হেঁটে যাছে মানুষ
অসহ বুকের একাকীত্ব নিয়েই
রোদের জন্য লিখতে হবে আশা
তাই তো নদীর মতো থাকতে হবে
টানটান বহমান
বাঁচার জন্য প্রতীক্ষার সলতে
পুড়ে যাবে অবিরল
তবু যতক্ষণ আছে প্রাণবায়ু
লড়াই নিয়ে খুঁজি প্রেরণার আশ্বাস।

পল্লব চট্টোপাধ্যায়

রাস্তা

যখনই হাঁটি, চলি একটার পর একটা রাস্তা
সামনে এসে দাঁড়ায়-
ভাবি কোন রাস্তায় যাবো.....,
আচ্ছা সব রাস্তা কি একই জায়গায় পৌঁছে দেবে।
চৌমাথার মোড় এলে-
আমি যে বিভ্রান্ত হয়ে যাই
শুরু, গন্তব্য সব কেমন গুলিয়ে ফেলি।
তখন আকাশের তারাগুলি আমায় চিনিয়ে দেয় রাস্তা ।

সৈকত নায়েক

সংশোধনের শব

মার্গসংগীতের শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে
হে অদ্‌ভুত বেহালা, তুমি কি বেজেছো এই পথে?

হঠাত্‌ ঝড়ো হাওয়া আলো নিভে যেত উল্লাসে
দু'হাত উর্দ্ধে রেখে বলো হে ভবিষৎ
এ-অন্ধকারে তোমারে হারাতে চাই?

চিৎকারের ফাটল, ফাটলে ইতিহাস বাক্যলব্ধ হয়
সংশোধনের কথা ফেরাচ্ছ সেই চিৎকারেই
দ্বন্দ্ববিহীন শব পড়ে আছে _
মা ও ভূমি -- কাকে ডেকে দেখাবে রঙ
প্রাজ্ঞতার চত্বরে হঠাত্‌ বৃষ্টি এল
সমবেত দুঃখবোধ, নির্জন অসহায়তা সংগোপনে

লজ্জিত তারা টেনে তোলে ছড়
সংগঠনী চেতনায় মানুষের অর্বুদ সঞ্চয়।

সুব্রত দেব

একা একা

তুমি যা বলো তার সবটুকু সত্যি নয়।
আমি যা বলি তার সবটুকু মিথ্যে নয়।
তবু দু'জনেই ভাবি, 'আমি'ই পুরোপুরি নির্ভুল!
এই ভুল-নির্ভুলের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে -হাঁটতে
আমরা
বিন্দুতে মিলিত হবার বদলে হয়ে যাই
একজোড়া সমান্তরাল সরলরেখা ।
তাই শেষ অব্দি গোটা জীবনটা আমরা
একাই কাটাই।
একা -একা।

তীর্থংকর সুমিত

পথ

হেঁটে চলি
পায়ে পায়ে সবুজের দিকে
কিম্বা কংক্রিট পেরিয়ে
কোনো মরুভূমির পথে
যেখানে
সকালের গন্ধ
দুপুরের রোদ
আর বিকেলের ধুলো
আমায় এগিয়ে নিয়ে যায়
বহুদূর
ক্রমশ এগিয়ে যাই

এগিয়ে যেতে থাকি...

CHITROKTI POTRIKA

অর্পিতা

স্বপ্ন

অবচেতনের চরে চক্কর কেটে ক্লান্তিতে শুয়ে সদ্যপ্রসূতা মেঘ
শতাব্দীর চিত্রিত কুলোয় প্রসব করেছে একবুক বৃষ্টিছড়া,
বিক্ষিপ্ত পংক্তিমালায় অক্ষর সাজিয়ে অপেক্ষায় নবজাতকের
নীল কোলাজের আকাশে খেলে পরমা আশীষ ধারা।

জন্মজন্মান্তরের সেই মেঘের বুকে আঁকা পদ্য কবিতা
সুখ ঝরায়, কান্না নামায় সফেদ খাতার নরম পাতায়;
অবাক সিঁড়ি টপকে গিয়ে যেই ছুঁতে চাই নবজাতকের মুকুট
ইতিউতি রোদ বিলানো সূর্যটা নৃত্য করে কবির মাথায়।

নাকের নোলক, পায়ের নুপুর ছড়িয়ে দিয়ে গোধূলি জ্বলে
সান্তনা বীজ মুখে পুরে আঁকড়ে ধরি সান্ধ্য আলো,
দুলিয়ে ঝুঁটি মধ্যরাতি লটকে থাকে নিমের মগডালে
আধখাওয়া চাঁদের চরকা বুড়ি সুতো নাচায় জমকালো।

ভোরের কপালে আলতো চুমু এঁকে স্বপ্ন বুনি ঝলমলে সাজে,
সুখপরীটা জিয়নকাঠি ছুঁইয়ে দেয় আদুরে মনের ভাঁজে।

অনসূয়া দত্ত

ভাষাহীন গল্প

কথা ফুরিয়ে যায়, হয়তো ইচ্ছেগুলোও
জমতে জমতে নিস্পৃহ হয় একদিন;
অলস বিকেলের নরম আলো নিভে গিয়ে
দমকা হাওয়া নিয়ে আসে কালো মেঘ,
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে, নিরালা বারান্দায়
মন কেমনের গল্প না লেখাই থেকে যায়।
বুঝলে প্রিয়, সব অনুভূতির ভাষা থাকেনা
সব অনুভূতি কলম, কী প্যাডে ধরা দেয়না
কিছু অনুভূতি আকুতি থেকে যায় শুধু চোখ জুড়ে।

CHITROKTI PATRIKA

স্বর্ণেন্দু সরকার

অ্যামিবা

ঝড়ে উড়ে আসা এসকিমোটা আগে জলতরঙ্গ বাজাত-ওর কি নেই ইচ্ছে ডানা?
আমি এখন পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি-গায়ে থুতু ফেলতে মানা।

জ্যোৎস্নায় বসে সাপ সিদ্ধ করি-নাভিতে বাসা বাঁধে লাঞ্ছনা....
মহামাত্যদের জুতো সেলাই করতে করতে মৃত্যুকে ডেকে বলি-আমাকে কেন টানছ না?

অহরহ নীল আলো জ্বলে-সূর্য সাগরে নেভে, চিকিচিকি স্বপ্ন খসে অকালে..
রক্তবমিকে সঙ্গী করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে হাসি-মিছুটান ছিঁড়ে যায় প্রেতের মায়াবলে।

কাঁটাতারে ছিঁড়ে যায় শরীর-নর্দমার জলের তোড়ে ঘরে আসে কচুরিপানা...
সারা গায়ে আঁচড়ে দেয় নেকড়ে-কচমচিয়ে খায় একরাশ অবমাননা।

কত সম্রাট বুকে ছুরি মারে-ভয়ার্ত কাকের দল জ্যোৎস্নায় পাক খায়; নীল সাগরের তীরে বড়ো একাকী.....
শশ্মানের আঁশটে বাতাসেই শান্তি-গতজন্মের শোক হাতে পরায় রাখি।

গায়ে দুর্গন্ধ আমার-অ্যালুমিনিয়াম চাঁদে আমাকে খুঁজে পাবি.....
নীলকণ্ঠ ভোরের প্রান্তরে ওড়ে-তারাদের মাঝে বসে আদম-ইভের কথা ভাবি।

টেলিফোনটা একনাগাড়ে বেজে চলে....অমীমাংসিত অসীম সর্পিল গ্যালাক্সিতে হারিয়ে যাব-হিসাব মেটাতে আর দু-তিন পয়সা বাকি;

দেশ থেকে পুরানো দেশে ফিরে যাবে দেশের স্টিমার-প্যাস্টেল,স্প্যাচুলা হাতে কয়েক ঘণ্টা পরে মৃত্যুর স্বাদে মাথা রাখি!

সাগর শর্মা

বিজ্ঞানমনস্কদের প্রতি

বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান, এই তো সারমর্ম
বিজ্ঞান নিয়ে রাজনীতি করা তোদের হয়েছে ধর্ম।
বিজ্ঞানের নাম ভাড়িয়ে ঘাড় করছিস উঁচু-
তাই তো বিজ্ঞানমনস্ক তোরা করিস নি ঘাড় নীচু।
জীবনে বোধ হয় পড়িস নি হায় বিজ্ঞানের এক পাতা!
মিথ্যা মিথ্যা দোহাই দিয়ে মানিস না বিধাতা।
ভগবানে বিশ্বাস নেই হায় রে যুক্তিবাদী!
চোখ নেই তোর,কান নেই তোর,মায়ায় রয়েছিস বাঁধি।

ভগবান দেন না দেখা চান না কৈফিয়ত,
মানতে তারে তাই অনীহা এই কী তোদের মত?
বিজ্ঞান পড়ে হচ্ছিস স্কলার, সস্তার ডিগ্রিধারী
দেশ ছেয়ে গেল কুসংস্কারে কে দেবে মূল্য তারি?
বলতে পারিস জীবনে কী কভু করেছিস প্রতিবাদ?
পেরেছিস কী ঘুচাতে ওই ক্ষুদ্র ধর্মের বাঁধ?
আমার কথায় না চাইলে দিস না মোটেই পাত্তা-
জ্ঞানের বাণী শুনাইতে থাক এই তো তোদের সত্তা।
হাতের কাছে পাই না তাই করতে নারি জব্দ
জন্মের মতো করে নে তোরা মূর্খের মতো শব্দ।

মনোজকুমার মণ্ডল

অবেলায় ভিজি

অবেলায় ভেজার ইচ্ছেয় এই কপোতাক্ষ তীরে
এখানে তুমুল ভিজেছি আমি
দূরন্ত কৈশোরে, ফাল্গুনে, বৈশাখে অথবা শ্রাবন দুপুরে;
আজও যার পলল গন্ধ একান্ত আমার ভিতরে।
অন্তর্গত স্নানে কুল কুল ফেনীল সোহাগে ভিজি
ধ্রুপদী নৃত্যমুখর লীলাবতী পায়ের ঘুঙুরে
চঞ্চল অঞ্চল নীলে উচ্ছসিত প্রসন্ন জোয়ারে
কলরোলে মোহনার অনিন্দ্য সঙ্গীতে।
খাঁ খাঁ খরা দেহে জোয়ারের স্পর্শ আঘ্রাণে
হারানো অতীত খুঁজি নেমে গহন গহীনে।
আমায় সে ফিরিয়ে দেয় অনন্ত সোনালি আকাশ,
হারানো পদাবলীর মোহন বাঁশরি,
সমস্ত বসন্ত দিন অবেলার মোহন নির্জনে।

সৌম্যজিত ঘোষ

ভালো থেক প্রিয়

তোমার ভালো থাকায় শান্তি জায়গায়,
না থাকার কষ্টটা, কিছুটা হলেও মিলিয়ে যায়।
তোমার ওই ভালোবাসা এনেছে
এই ছন্নছাড়া মানুষের মনে
এক ফোঁটা সুখের সুর ।
শত শত দুঃখের মাঝেও
ঢাল হয়েছ আমার তুমি
অন্ধকারের মাঝে জাগিয়েছো আসাদ নূর ।
তোমার অবদান রয়ে যাবে চিরতরে
মোর ছন্নছাড়া মনে ।
না থাকলেও আমি,
প্রিয় ভালো থেকো এ জীবনে ।

কাশীনাথ সাহা

স্বপ্নময়

আমি তো থেমেছি মাটির কাছাকাছি
তোমার দুচোখে বিদ্যুৎ ভরা আলো
নদীকে ছুঁয়ে বলতে পারিনি আজও
দুজনের চোখে কতোটা স্বপ্ন ছিল।

পাহাড় কোলে অবাধ্য হাতছানি
বসন্ত এসে ফিরে যায় অভিমানে
তবুও বাতাসে প্রবল দখিনা হাওয়া
স্বপ্ন ভাসছে জীবনমুখী গানে।

একটা জীবন মাটিতেই চাষাবাদ
জলের বুকে স্বপ্নীল আঁকিবুঁকি
দুই খরস্রোত দুজনেই গেছি ভেসে
তবুও আমরা স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখি।

একটি জীবন অবাধ্যতার ঢেউ
থেমেছি আমরা অবাধ্য সেই মন
হারাতে হারাতে নিঃস্ব হয়েও দেখি
রূদ্ধ মাটিতে থেমে আছে ক্রন্দন।

স্বপ্ন ভেঙেই একটা জীবন পার
ভরা যমুনায় কিছু তরঙ্গ ভাসে
অনিকেত পথ স্তব্ধ হৃদয় পোড়া
খুঁজছি তোমায় গোপন দীর্ঘশ্বাসে!

বিষন্নতার সর্পিল পথ ছেড়ে
আমরা হাঁটবো, পথও নেব খুঁজে
আগামী সকাল হয়তো চিনে নেবে
শিলালিপির দুর্গম কোন ভাঁজে!

প্রতীক মিত্র

এখনও ইচ্ছেগুলো

এখনও যেসব ইচ্ছেগুলো দিগন্ত ছুঁয়ে থাকে
সেগুলোকে লুকিয়ে রাখি।
ভালবাসার তেরছা আলোর নীচে
জমতে থাকে অন্ধকার।
দু'চোখ বুজিয়ে অবসরের দীর্ঘতাকে
সার্থকতা দিয়ে কাটাকুটি করে
বাকি থেকে যায়
নীরবতার ভার,
দেওয়ালের কোণে বিস্ময়।
থাক আখ্যানের চমকের
যদি কিছু বাকি থাকে থাক।
ব্যক্তিগতের পরিচ্ছেদের পাতাগুলো
ওড়ে,পোড়ে তারপর হাতরে বেড়ায় পরিচয়।
দিগন্ত-ছুঁয়ে থাকা ইচ্ছেগুলোকে লুকিয়ে রাখি।

দেবাশিস সরখেল

আক্ষেপ

তুমি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলে
আমি আছি কিনা

ছিলাম লোকচক্ষুর অন্তরালে
ছিলাম পলাশ শিমুল পুটুশের আঁচলের তলে
তুমি চলে গেলে কাউকে কিছু বলেও গেলে না
বিরহ অনলে কত পুড়েছিলে দেখা হলে হতো
মিলন উৎসব তোমার নিথর শব
সে কথা জেনে গেলে না বলে
অঝোর কান্না ভাঙ্গে নব মেঘদলে ।

দেবব্রয়ী হালদার

উড়োচিঠি

উড়োচিঠি মানে মনে জমানো বিশাল তথ্য ভান্ডার
না বলা অনেক কথা, সঙ্গে কিছু আবদার।
অনেক অনুভূতি ব্যক্ত হয়না, সামনে থাকলে মানুষটা
দূর থেকে সব জানালাম, প্রমাণ এই চিঠিটা।
উড়তে উড়তে পড়িস ঠিক তার বাড়ির উঠোনে
জানাস তাকে, তার তরে ভালোবাসা জমানো আমার মনের কোণে।
সে যদি তোকে না পড়ে, ফিরিস না তখন মোর কাছে
মন থেকে জানবো তবু আমার চিঠিটা তার কাছে আছে।
আর কোনো উড়োচিঠি পায়নি ডানা মনের শব্দের অভাবে
আজ অনেক কিছু বলতে মানা আগে বলতাম যেভাবে।
তাকে ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টায় শব্দেরা উদ্দেশ্যহীন
আমার সব শব্দ এখন তোমার ইচ্ছের অধীন।

রেজাউল করিম রোমেল

সময়

জীবনের কোনো এক সময় তুমি আমি
যদি গুনে যাই হাজার কোটি বছর,
তবু কি শেষ হবে গণিতের অগণিত সংখ্যাগুলো?
শত কোটি কোটি বছর যদি হাঁটতে থাকি
মহাকালের চেনা অচেনা পথে তুমি এবং আমিও।
সে চলার পথ শেষ হবে কি?
তুমি কি পারবে মহাকালের চলার পথকে
থামিয়ে দিতে এক সেকেন্ড?
যান্ত্রিক ঘড়ি চায়লেই থামিয়ে দেয়া যায়।
কিন্তু জীবন ঘড়ি!
তুমি কি চায়লেই জীবনের এক সেকেন্ড থামিয়ে দিতে পার?
তুমি কি পারো ঘটে যাওয়া ঘটনা বা দূর্ঘটনা
পুনরায় আবার নতুন করে ঘটাতে?
যে চলে যাবার সেতো চলে যাবে,
আর যে আসবার সেতো আসবেই।
এই মহাবিশ্বের মস্তোবড় নাট্যমঞ্চে
তুমি অভিনেত্রী আর আমি অভিনেতা মাত্র।

CHITROKTI POTRIKA

বলাই দাস

সেকথা তোমাকে বলা হয়নি

স্ট্রিটলাইটের ভালোবাসা কুয়াশা জড়ানো, শূন্য তহবিল
কপাল ভরা অভিমান নিম স্বাদের রোদ্দুর---
অন্ধ পাখিও প্রেম নিবেদন করে, বোঝে ভালোবাসার মর্মকথা
মুক্ত আকাশে উড়াউড়ি স্বপ্নের তিরস্কার সত্বেও---
রঙবাহারি অন্তরাগের কথা তোমাকে বলা হয়নি....
মায়াবী চাঁদ লিখে মিষ্টি মধুর প্রেমের উপাখ্যান। অথচ সম্পর্কের
বাঁধন শত-শত আলোক বর্ষদূর----

ঝড়-ঝঞ্ঝা ছুঁতে চায় আকাশ সীমানা, মহাশূন্যের সৌন্দর্য যে বিশালতা জাদু ক্ষমতায় ভরপুর; ওঃ কি ভয়ংকর তার উপমা!
অতৃপ্ত বাসনা! সরলতা নেই সেখানে শুধু স্বার্থের আঘাত, বাস্তবতার ভাঙা মেরুদণ্ড,
সেকথা তোমাকে বলা হয়নি কারণ
ই-রেজারে মোছা যায়না সেই সব কলঙ্ক ছাপ।

মানসম্মান, যশখ্যাতি, অর্থের ভিখারি এই দুনিয়াদারি,সে চিন্তা নেই--ঈশ্বর আজ হাসতে ভুলে গেছেন ; পিরামিডের প্রেমতত্ব এখনো আবিস্কার হয়নি। সেকথা তোমাকে বলা হয়নি---
একলা দাঁড়িয়ে স্ট্রিটলাইট দেখে রঙবাহারি অন্তরাগ!

শুকদেব দে

আলাদা মিল

হাসপাতালে আমি আর মাখন বন্ধু হয়েছিলাম৷
ওর বাবা আর আমার বাবা বক্ষবিভাগে ভর্তি৷
আমাদের মায়েরাও বুড়ো বয়সে নতুন করে
বান্ধবীর খোঁজ পেয়েছিল৷
দারোয়ানের মতো রোগীদের পাহারা দিয়েছি
একজনের অনুপস্থিতিতে আরেকজন৷
ওষুধ কিম্বা কোন জিনিসের দরকার হলে
একে অপরের জন্য এনে দিয়েছি কতবার৷
দুঃখের ফাঁকে হাসি মস্করা,সিগারেট খাওয়া–
এসব তো ছিলই৷
এভাবে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল৷

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বলেছিলাম–
ফোন করব নিয়মিত...
তখন থেকে ফোনে কথা বলতাম আমরা সবাই।
কিছুদিন পর ফোনের ব্যবধানও বাড়তে থাকে,
শুনি, মাখন চাকরী পেয়েছে দূরে কোথাও।

একদিন ফোনটা অনেকবার বাজতেই থাকে...
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।
আসলে মানুষকে মানুষে মিলিয়ে দেয় দুর্ভাগ্য,
আর আলাদা করে টাকায়!

রথীন পার্থ মণ্ডল

নিঝুম রাতের কান্না

হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙে মাঝরাতে
আলো জ্বালতেই দেখি হৃদয়ের গভীর থেকে
পাখা সম্বলিত পিঁপড়েরা আলোর দিকে উড়ে যায়
যেখানে মৃত্যুর সাক্ষাৎ নিশ্চিত জানে,
জেনে ইচ্ছে গুলো মরে যায়।

বাথরুমের ট্যাপ থেকে জল ঝরবার শব্দ
শুনি শুয়ে শুয়ে
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে যায় স্বপ্নগুলো!

বেওয়ারিশ কুকুর বিলাপে জানায় যত কষ্ট
ট্রাকের চাকার নীচে পিষ্ট কবিতার ব্যাকুলতা
কাঁদে অসহায়, তবু জেগে থাকে বিদগ্ধ মন
মুখ থুবড়ে নর্দমায় পড়ে অনুভূতি।

মাঝরাতে প্রায়ই আমার ঘুম ভাঙে আজকাল।

উদয়ন চক্রবর্তী

অধঃপতন

কৃষ্ণ গহ্বরের ঘা ঘেঁষে
তারাদের রক্ত অশ্রু চুইয়ে পরে
আপাত নিস্তরঙ্গ শূন্যতায় তরঙ্গের নাচ
রূদালি করে সে রক্তক্ষরণ

সবারই জন্মক্ষণ একটা বিগ ব্যাং
তারপর গানিতিক সমস্যার ব্যর্থ খোঁজ
সংগ্রহের পিছুটানে নিঃস্ব অতৃপ্ত শোক
সংখ্যার আধিক্যে শূণ্যের অন্তহীন সংরক্ষণ

এসো তবে একসাথে দাঁড়িয়ে থাকি
পৃথিবীর চূড়ায় ভাগভাগ দিগন্ত রেখায়
ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির বুকের ভেতর ঘুমিয়ে থাকুক কূট শব্দরা
যতদিন থামিয়ে রাখা যায় মানবের শেষ
অধঃপতন।

CHITROKTI POTRIKA

মনিরুজ্জামান প্রমউখ

স্বাধীনতা মোহনা

স্বাধীনতার রুমাল উড়ে অমহানে
চালা উড়ে গেলে থাকে শুধু দলাবদ্ধ মাটি
ভাঙ্গা পা নিয়ে ড্রিম এলায়েন্সও দৌড়েছিলো
জয়ের পতাকা উড়ালেও মেলেনি ঐ শব্দটির প্রিয়া
অমরিদের নেই ভোগ মেটানোর নিশ্চয়তা কোনো রহমে
স্বাধীনতার হেঁয়ালি ব্রেক থাকে বোলেই তার এতো কামাক্ষা
প্রেমের চলতি খোরাকে প্রিয়ার মুহূর্ত অনিহাও তার বরখেলাপ
পরিমণ্ডলে ধ্যান আর আগ্রহ নিয়ে পরিপূর্ণ করতে চাওয়া স্বাধীনতা
সম্ভাব্য পথে গোছানো পদক্ষেপে প্রতিনিয়ত অতিবাহিত করাও স্বাধীনতা
কল্পনার চাদর ঠিকরে যে মোহ নেমে পড়ে বাস্তবতার ভীড়ে সেও স্বাধীনতা

বিশ্বজিত্ রায়চৌধরী

প্রেম

ভালোবাসি ভালোবাসি দু'বেলা তোমায়
ভাল লাগে ভাল কথা না ঠেলি হেলায় ।
জীবনের নুড়ি পাথর দু'বেলা কুড়াই,
সাজিয়ে ঘর বাঁধি, যেমন বাবুই ।
ভালোবাসা সহজে দেয়না কো ভুলতে
কাঁটা না ফুটিয়ে হাতে পদ্মকলি তুলতে ।
রক্ত ঝরানো শুধু ভালোবাসার তরে,
হৃদয়ে যা গাথা হয়, কেমনে কে হরে?
ভালবাসার দিনগুলো মরমে পশিত,
নির্বান্ধব প্রেম কেমনে ঝরিত?
আজ যদি ভালোবাসি, কাল তা হয় না বাসি
কান্না সরিয়ে রেখে, চাই শুধু হাসাহাসি ।
বিশ্বের মাঝে প্রেম হোক না দীর্ঘায়ত,
করুণ দুঃখ বেদনা যা হোক না তা বিগত ।

শুভ্রকান্তি ভট্টাচার্য

বেরঙিন

সভ্য মানুষ বন্য যে আজ যুদ্ধতে
পায়ের নীচে পিষছে কেমন বুদ্ধকে

নিরীহ প্রাণ মরছে যেন পিপীলিকা

জীবন যেন 'হরেক মাল পাঁচসিকে'
রক্ত মেখে ছড়িয়ে আছে চারদিকে

কে জ্বালাবে জীবনদীপের দীপশিখা!

রঙিন হয়ে উঠুক সবার হৃদয়-মন
রঙিন হয়ে উঠুক সবার ঘরের কোণ

বন্ধ হোক আজ রক্তে খেলা এই হোলি

রক্ত শুধু জীবন বাঁচাক মুমূর্ষুর
জীবন জুড়ে যেন বাজে প্রাণের সুর

কন্ঠ ছেড়ে এই কথাটাই আজ বলি!

CHITROKTI PORIKA

শুভদীপ দত্ত প্রামাণিক

অর্ধচন্দ্র

কী হয়েছে তোমার?
মধুপ অভিমান?

ব্রহ্মতালুতে কাঠপিঁপড়ের দোহারা লাইন,
নগ্ন হয়ে কবিতা লিখি,
অনিদ্রা.... কখনো দুঃস্বপ্নে দেখি বেশ্যাপাড়ার চাঁদ।

আয়নার সামনে স্বামীর ঘর।
কর্তা ইত্বরী নিয়ে খেলা করে উপাসনার পিছনে!
নৈরয়িক,
নাইয়ার হাতে ফড়িংয়ের লাশ!

ঘূর্ণাবর্ত..... মধু-কৈটভ
ডাকের সাজে মা আসছেন,
দশ হাতে শুধুই খন্ডহার!

সুদীপ্ত বিশ্বাস

বাউল

একলা বেশ তো আছি, একলা থাকাই ভালো
দুপুরে ডিস্কো নাচি, রাতে পাই চাঁদের আলো।
কোনো এক নিঝুম দুপুর, কিংবা গভীর রাতে
মনে আর পড়েই না তো,টান দিই গঞ্জিকাতে।
পরোয়া করব কেন? সমাজটা দিচ্ছে বা কী?
ছোট্ট জীবন আমার, তাইতো নাচতে থাকি।
পলকা এই জীবনে, কী হবে দুঃখ এনে?
চল্ না উড়াই ঘুড়ি, সুতোতে মাঞ্জা টেনে।
লাফিয়ে পাহাড় চড়ে, সাঁতরে নদীর বুকে
কবিতা দু'এক কলি আসলে রাখছি টুকে।
এভাবে কাটছে তো দিন,তোমাকে আর কী খুঁজি?
জানিনা কোথায় তুমি, আমাকে ভাবছো বুঝি?
ভাবলে কী হবে আর, নদীতে জল গড়ালে
চাঁদটা বন্ধু আমার, গভীর এই রাত্রিকালে
গাছেরা আগলে রাখে, পাখিরা গাইতে থাকে
ঘরে আর যায় কী ফেরা? ওই যে বাউল ডাকে!

গাজী আবু হানিফ

পথ

পথহীন যাওয়া যায় না ঠিকানায়
হয় না লক্ষ্য স্থির;
পথে থাকলেই পথ নিয়ে যায় পথের মাথায়
ভীরু হয়ে যায় বীর।

জয়মাল্য একদিন পরাও যায় গলে
জীবনে আসে সফলতা;
তবে পথে থাকতে কষ্টে কষ্টে ছাই হতে হয় জ্বলে
সইতে হয় বিফলতা।

পথই আমাদের শুভ সুখের একমাত্র বন্ধু
পথছাড়া এ জীবন মূল্যহীন;
পথে থাকলে এক সময় পার হবেই মহাসিন্ধু
বাজবে একদিন আনন্দ বিজয় বীণ।

CHITROKTI PATRIKA

অম্লান বাগচী

বন্ধন

গৃহাগত জাহাজ। তাই নোনতা বিষাদে ভেঙে পড়ে
ঢেউয়ের হাত। সেখানে সম্ভার বাঁধা

নিরূপণ করতে গিয়ে নেমে গেছে ফেনার তলায়।

একবার মুখ তোলা আকাশের গায়ে তার বাঁধন
চাউনির পাল ছিঁড়ে তাকিয়েছ সুলগ্ন বিথারে
দুয়ারের ছাপ তাই এঁকেবেকে চমকে হারায়
হারায় তারও দ্যুতি, মেঘবল্লরী চোখ
একরাশ অভিমান টেনে আমাকে
চলে যেতে বলে অবশেষে নিজেই ভেঙেছে নোঙর।

নীলম সামন্ত

ধর্ম বলে কিছু নেই

সূর্য জন্মাচ্ছে, অর্ধেক তোমার বুকে অর্ধেক আমার।

দাঁড়িয়ে রয়েছি প্রচন্ড আগুনের ওপর।
ক্রমশঃ অদৃশ্যমান চারটে হাত
মেখে নিচ্ছে পরমান্নের ভাস্কর্য।

দারুব্রহ্ম। পঞ্চকোষ।

প্রার্থনাতে বসার আগে মানুষ হোক
পশুরা ফিরে গেছে ব্রহ্মলোকে।

ঘুম নেই।
আঘাতের ওপর রক্তচন্দনের টিকা লাগিয়ে শুরু হয় সংকল্প।
দিন রাত মিশে যায়।

এক সময় উন্মুক্ত নাভিকমল থেকে জন্ম নেয় নিষিদ্ধ রাজহাঁস।
তখনই নির্বাক শূন্যতা শিখিয়ে যায়
ধর্ম বলে কিছু নেই।

CHITROKTI POTRIKA

মহাজীস মণ্ডল

প্রেমের কাহিনি

নক্ষত্র জ্বলে দেখি
আকাশে এবং আকাশে
সুদূরের কোনও ডাক নয়
বুকের শব্দ শুনি দিনরাত

ভালবাসার বাতাসগুলো ডাকে
ইশারাগুলো বড় ইঙ্গিতময়
হরিণী চোখের ভাষা লিখতে
পান্ডুলিপির পাতা শেষ হয়ে যায়

সমুদ্র আজও আছড়ে পড়ে
বুকের অনন্ত তৃষ্ণা মেটাতে
অলিখিত তাই রয়ে গেছে
তার প্রেমের কাহিনী...

দেবযানী মহাপাত্র

গোড়ার কথা

তারপর জল সরে গেলে
আরও একবার স্পষ্ট হয়ে যাবে
আমাদের গোড়ার কথা

দুটি একটি সবুজ পাতা শুদ্ধ আমরা
ক্রমশ ঝুঁকতে ঝুঁকতে দেখব;
শিকড় থেকে ধুয়ে গেছে মাটি

পোড়া বল্কলে হাত রেখে জেনে নেব,
শুধু আগুন নয়
জলও কখনও কখনও সর্বগ্রাসী হয়।

নীলাঞ্জন কুমার

বন্ধুবৎসল

১।
এ কঠিন সময়ে বন্ধুত্বের ভেতরেও
সন্দেহ জেগে ওঠে ।সমস্ত অবিশ্বাস নিয়ে
তাকে যাচাই করি । সত্য সেলুকস্...

২।
ঝাঁপিয়ে আসা স্বপ্নের ভেতরে
বন্ধু । স্বপ্নে তীর্থস্বাদ । উন্মাদ
স্বপ্নালু প্রহর তখন জড়িয়ে ধরে ।

৩।
বন্ধু-র ভালোবাসা বন্ধুর পথকেও
ডিঙিয়ে যাবার প্রেরণা দেয় । বন্ধু
হাত ধরলে বড় শান্তি!

তখন স্বর্গস্বাদ ।

CHITROKTI P

তাপস বন্দোপাধ্যায়

প্রস্থানপর্বের ভাষায়

দিনান্তের চিঠি পড়ি অবনত গোধূলিবেলায়।
এখন সন্ধ্যাগুলো আর ততটা ফেনিল নয়
উত্তেজনা ঢিমে আঁচে ফোটে
তর্জনী উদ্যত হবার আগেই
কেঁপে যায় বিনাশী হাওয়ায়।
খুঁজিনা তোমার চুলে দুরন্ত বিদ্যুৎ
জিহ্বাতাড়িত না হয়ে প্ররোচনা খসে পড়ে
রাত্রির আস্তিনে,বিছানার ভিক্ষাপাত্রে
অঙ্কুরিত আত্মা রাখি ভেজা বারমাস্যায়।
বৃক্ষকে বন্ধু মনে হয়,বৃষ্টিকে উপশম
আর গেরস্থালী প্রস্থানপর্বের ভাষায়
লিখে রাখে দৃশ্যকাব্য পায়ের পাতায়।

গোপেন মণ্ডল

গোধূলিবেলা সাঁঝের বেলা

দিন ফুরিয়ে গোধূলি হলো রবির এবার ছুটি,
ক্রমশ আঁধার ছেয়ে গেল চন্দ্র উঠি উঠি।
ঘরে ফিরি কৃষক সবে পাখি ফিরি নীড়ে,
শঙ্খ ধ্বনি ভেসে এলো প্রতিটি ঘরে ঘরে।
গরু ছাগল মাঠের থেকে ফিরল গোয়াল বাটী,
সোনালী রোদ মুছে গেল ঠান্ডা হলো মাটি।
হরিৎ বৃক্ষ কালো দেখায় পাহাড়ের মতো সাজে,
মাঠের পরে শিয়াল ডাকে আসি শিকারের খোঁজে।
ঘোমটা মাথায় গৃহবধূ জ্বালছে সাঁঝবাতি,
তারাগুলি সবে উঁকি দিয়েছে থাকবে সারারাতি।
জোনাকিরা ধায় এধার ওধার জ্বালিয়ে নিজের আলো,
জোছনা ঢাকে ক্ষণে ক্ষণে উডডিন মেঘ কালো।
খুড়ো মশায় দুয়ারে বসি সাজবে এবার তামুক,
ঠাকুরমা বসে উঠান মাঝে চা - এ তৃপ্তির চুমুক।
হারিকেনের মৃদু আলোয় শিশুরা পাঠে বসে,
যাত্রা দলের রিহার্সালে বংশীবদন হাসে।
ঐ যে আমার মা ডাকছেন "কৈরে কোথায় গেলি"
বাকি কথা পরে হবে, এখন আমি চলি।

কবিতা ধর

আমরা আগামী

তুমি কতদূর ভেবে এগিয়ে যেতে পেরেছো!
আলতা ভেজানো পায়ে কতদূর তুমি প্রতিবাদী হতে শিখেছো!
ঠোঁটের ওপর ক্যারামেলের প্রলেপে যখন
হৃদযন্ত্রের ওঠাবসা প্রতি ঘন্টায়,
জড়িয়ে নিলে আবার সেই
পুরোনো কোলবালিশের ভিজে চুপচুপে কভার।
ধরে নিলাম এইভাবেই এগিয়েছ বহুদূর
রোদে শুকিয়েছে সব,
গলে পড়া সময়, বয়ে যাওয়া ক্যারামেল,
ভোরের ভেজা উঠোনের ঘাস,
সন্ধ্যা বাতির শেষ তেলটুকু চুইয়েছে পিলসুজে।
বাকি আছি শুধু তুমি আর আমি....

ছড়া

বিপুলকুমার ঘোষ
হারিয়ে গেছে শৈশব

ছেলেবেলার স্মৃতিগুলো
আজও মনে পড়ে,
লাগামছাড়া হৈহুল্লোড়ে
কাটতো মজা করে।

সকাল বিকেল দল বেঁধে যে
চলতো হরেক খেলা,
উঠোনে আর বাগানেতে
বসতো শিশু মেলা।

জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে ছুটে গিয়ে
আমার কুড়িয়ে আনা,
রোমাঞ্চকর শৈশব ছিল
যেন সুখের দানা।

কচিকাঁচার শৈশব আজ
হারায় বইয়ের চাপে,
ড্যাডি ম্যামির শখ মেটাতে
ভয়ে তারা কাঁপে।

শ্রীকান্ত মাহাত
বায়না

খুকুমণি ধরে বায়না
কিনে দে গয়না।
না-হলে পরব দেখতে
আমি যাবোই না।
দেখো খুকি, এই বছর
চল্‌ছে করোনা।
টাকাকড়ি নেহাত কম
একটু বোঝ না।
অতসত আমি বুঝি না
না হলে খাব- না।
ওগো আমার লক্ষ্মীসোনা
কিনেছি গয়না।
সেজেগুজেই রেডি হও
মেলাতে চলো না।

হারানচন্দ্র মিস্ত্রী
এল বসন্ত

একটি দুটি আমের গুটি
গাছের তলায় পড়ল ধূলায়।
কুড়ায় ভোরে আদার করে
খোকা-খুকী সামনে ঝুঁকি।
লবণ মেখে দেখল চেখে,
মাও খেল স্বাদও পেল।
কোকিল এসে বসল ঘেঁসে,
ডাকল- কুহু মুহুর্মুহু।
বাজল শ্রীখোল ফাগুনের দোল,
রঙের খেলা সারাবেলা।

CHITROKTI POT

গল্প

ভবানীশংকর চক্রবর্তী

তছনছ

ঘুম ভাঙতেই জানালা দিয়ে রোদ ঝলমলে সকাল দেখতে পেল কুঞ্জ। দুসপ্তাহ পর জেল থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে নিজের শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সকালের আকাশ দেখল সে। রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল দেখতে খুব ভালোবাসে সে। কিন্তু আজ ভালো লাগছে না।তার বুক জুড়ে বিষাদের অন্ধকার। শ্রীমতি কেমন আছে খুব জানার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কীভাবে জানা যায় ভাবতে ভাবতে বিছানা ছাড়ল কুঞ্জ।

ঘটনাটা সামান্যই। বন্ধুর বিবাহ বার্ষিকীতে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল কুঞ্জ।এক বছরেরও বেশি সময় বিয়ে হয়ে আসা তক কুঞ্জকে কোনো দিন নেশা করতে দেখেনি শ্রীমতি।রাগে অভিমানে কুঞ্জকে জিগ্যেস করেছিল ' তুমি মদ খাও?'
'বেশ করেছি ' বলে নেশার ঘোরে শ্রীমতিকে ঠেলে দিয়েছিল। অতর্কিত ধাক্কায় মেঝেতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল শ্রীমতি। খাটের কোণায় লেগে মাথা ফেটে রক্তপাত হয়েছিল। ঘটনা গড়িয়ে যায় অনেক দূর। শ্রীমতি যায় হাসপাতালে আর কুঞ্জের ঠাঁই হয় জেলখানায়।

বাইরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল কুঞ্জ। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে। বাইরে দাঁড়িয়ে শ্রীমতি একা। কুঞ্জ হতবাক। ভেতরে ঢুকে দোর বন্ধ করে কুঞ্জের সব বিস্ময় কৌতুহলকে তছনছ করে দিয়ে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রীমতি।

বনানী শিকদার

বন্ধুবিহঙ্গ

বড্ড পরচর্চাপরায়ণ মেয়ে। যখনতখন এসে যার-তার বদনাম করে। সারা দুনিয়ার লোকের বাড়িতে তার কখনো নিয়মিত কখনো অনিয়মিত যাতায়াত, সারা দুনিয়ার লোকের গোষ্ঠী উদ্ধার। অন্যের বাড়িতে গিয়ে নিশ্চয় আনিশারও গোষ্ঠী উদ্ধার করে। আনিশা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, “কি গো আমাকে নিয়ে কার কার কাছে কি কি বদনাম করলে?” চোখ বড় করে সে বলেছিল, “কি! আমি সবার কাছে তোমার সুখ্যাতি গাই।”

“সুখ্যাতি! যেমন?”
“যেমন তুমি বুদ্ধিমতি, বিশাল মনের, ভাল রান্না করো। আমাকে পেট ভরে খাওয়াও।”
জবা বলে, “কালকে পিজ্জাটায় কি টপিংস দেবে?”

আগামীকাল আনিশার জন্মদিন। ঠিক হয়েছে সে কেক, পিজ্জা, মাটন, রুমালি রুটি এবং কালাকান্দ খাওয়াবে। সুস্মিতার বাড়িতে পালন করা হবে। থাকবে সুস্মিতা, জবা, মৃণালদা, সুপ্রিয় এবং সুস্মিতার মেয়ে। আনিশার গত বছরের জন্মদিনের আগের দিন পর্যন্ত জবা সুস্মিতাকেও একদম পছন্দ করত না। আসলে সুস্মিতার সঙ্গে মেশার সুযোগ পেত না। বলত, সুস্মিতার চরিত্র খারাপ। আনিশা বলত, সুস্মিতা ভাল। মৃণালদাকে পছন্দ করত না। বলত, মৃণালদার চরিত্র খারাপ। বলা বাহুল্য সুস্মিতা এবং মৃণালদাকে এক করে দিয়ে সে তাদের চরিত্র খারাপ দেখাত। সমালোচনার খাতিরেই মৃণালদার স্ত্রীর জন্য দুঃখ করত। আনিশা বুঝিয়েছে সুস্মিতা এবং মৃণালদার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। আনিশার গত বছরের জন্মদিনে সুস্মিতার মত পিয়াসা রেস্তোরাঁর ছ' তলার ছাদে আমন্ত্রিত হয়ে জবা সুস্মিতার সঙ্গে ভাব করে নিল। সুস্মিতার বাড়িতে তার যাতায়াত শুরু হল। বাড়ল যাতায়াত। আনিশার সঙ্গে সে মেলামেশা কমিয়ে দিল। প্রায় ভুলে গেল তার দ্বিতীয় স্বামীর প্রথম স্বামীর ছেলের ওপর অত্যাচার, থানায় কমপ্লেনট, সেখানে আনিশার উপস্থিতি, সাক্ষ্যদান। ভুলে গেল তার অর্থনৈতিক সংকটে আনিশার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য। ভুলে গেল তার মানসিক দুর্যোগে আনিশার সঙ্গে থাকা। জবা মৃণালদার সঙ্গে ফোনে ফোনে কথাবার্তা বাড়ালো, সুস্মিতার বন্ধু সুপ্রিয়র সঙ্গেও বন্ধুত্ব করল। আজ আনিশাকে জবার মনে পড়েছে কাল তার জন্মদিন বলে।

জন্মদিনে সন্ধে ছ' টায় জবা আনিশাকে একটা ফটো মেসেজর সঙ্গে পাঠালো। সুস্মিতার ডাইনিং টেবিলে জবা, সুপ্রিয়, মৃণালদা, সুস্মিতা এবং সুস্মিতার মেয়ে বসে। ক্যাপশন—উই আর ওয়েটিং ফর ইউ।

খুশীতে ডগমগিয়ে আনিশা সুস্মিতার সোসাইটিতে গেল। ছ' তলায় উঠে ওর দরজায় লাগানো কলিং বেল টিপল। সুস্মিতা দরজা খুলল। আনিশাকে দেখেই মৃণালদা বলে উঠল, "এসে গেছে লেংড়ি।" হেসে উঠল সুস্মিতা, সুপ্রিয়, জবা। পোলিওতে আনিশার একটা পা ক্ষতিগ্রস্ত, সুতরাং একজন সুস্থ মানুষের মত সে চলতে পারে না। চলতে পারে না বলে বিষণ্ন বোধও করে না যদি না আনিশাকে এমন আক্রমণের শিকার হতে হয়। মৃণালদা এর আগে অসংখ্যবার আনিশাকে লেংড়ি বলে উপহাস করেছে এবং আনিশা অনেকবার প্রতিবাদ করেছে, বুঝিয়েছে, কিন্তু লাভ হয়নি। শেষে সে একদিন বলেছে, "আপনি তো বিশাল মোটা।" সেদিন মৃণালদা চুপ হয়ে গিয়েছিল। আনিশা ভেবেছিল, কাজ হয়েছে তাহলে। কিন্তু না, মানুষটার স্বভাব সেই একই আছে।

আনিশা বলল, "ভুলে গেছেন সেদিন কি বলেছিলাম?"
হাসে মৃণালদা, "তুমি আমাকে মোটা বলো, আই ওন্ট মাইন্ড। কিন্তু তুমি তো লেংড়ি।"

লোকটির সঙ্গে আনিশার তর্ক শুরু হয়ে। 'দিস ম্যান ইজ রিয়ালি ইমপসিবল' বলে আনিশা ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। সুস্মিতা আনিশার হাত ধরে টেনে রাখে। বলে, "সরি।" জবা বলে, "তুমি ঠাট্টাও নিতে পারো না।"

“না, পারি না। ছোটবেলায় পড়নি কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই?” বলতেই আনিশার মনে পড়ে জবা তো স্কুলেই যায়নি। যায়নি বলেই তার ফর্মাল এডুকশন হয়নি। জবার বাড়িতে যে ইনফর্মাল এডুকেশন হয়েছে তার সিলেবাসে হয়ত এসবই ছিল—অপরের নিন্দা, অপরকে কষ্ট দেওয়া, অপরের যন্ত্রণার কারণ হওয়া এবং নিজের এমন চরিত্রকে যথার্থ বলে বিবেচনা করা ও অপরকে বিবেচনা করতে জোর করা। মৃণালদা স্কুলে গেছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে সে স্কুলে শেখা অনেক কিছু ভুলে গেছে। অর্থাৎ মৃণালদা স্কুলের অনেক শিক্ষাকে নিতেই পারেনি। স্কুল বাড়ি মিশিয়ে সুস্মিতা পেয়েছে আরেক শিক্ষা—নিজের সুবিধার্থে ঠিক ভুলের মাঝে দোল খেয়ে বেড়ানো। সুপ্রিয় নিরপেক্ষ। আনিশার বন্ধুর বন্ধুদের গলা জড়িয়ে জবা বসে রইল। আনিশা ফিরল এমন বন্ধুদের হারানোর অসম্ভব তৃপ্তি নিয়ে।

কয়েকদিন পরে নতুন বর্ষ। হোয়াটসআপ গ্রুপে জবাও এসেছে। আলোচনা চলছে পার্টির মেনু কি হবে। ছাব্বিশে জানুয়ারিতে তারা আবার গোয়া যাবে। ব্যাপকভাবে গ্রুপে তারও আলোচনা ঢুকে পড়েছে। আনিশার মোবাইলে অনবরত তার নোটিফিকেশন আসছে। একদিন হঠাৎ করে নোটিফিকেশন বন্ধ হল। আনিশাকে গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

মঞ্জুশ্রী মণ্ডল

লড়াই

আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। বাবা মাকে খুশি করার জন্যই আমার এই বিয়েতে মত দিতে হয়। যখন আমার দেখাশোনা করে বিয়ে হয় তখন বলেছিল ছেলের কুড়ি হাজার টাকা মাইনে ।খোঁজখবর নেওয়া হয়েছিল তা থেকে এটাই জানা গিয়েছিল। আর সেজন্যই বাবা-আমাকে গা ভর্তি গয়না দিয়ে, পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ দিয়ে আমার বিয়ে দিয়েছিল।

শুনেছিলাম ও একটা কাজ করে কিন্তু বিয়ের পর জেনেছিলাম ও কাজ করে না, ও জুয়া খেলে। যেহেতু কোনো কাজ করে না তাই আমার শ্বশুরমশাই আমাদের আলাদা করে দেয়। তখন আমার স্বামী আমার গয়না গুলো বিক্রি করতে থাকে।
আমি বুদ্ধি করে আমার কিছু গয়না বিক্রি করে আমি একটা সেলাই মেশিন কিনে তা দিয়ে সেলাই করে আমি কিছু রোজগার করতাম। কিন্তু সেই টাকাও আমার কেড়ে নিতো আর মারধর করতে শুরু করলো ।সাথে চাপ দেয় বাপের বাড়ি থেকে শুধু আনতে সবকিছু।
এক বছর পর আমার একটি কন্যা সন্তান হয়।

ওদের বাড়ি থেকেও খুব চাপ দিত আমাকে আরও নানা কিছু বাপের বাড়ি থেকে আনার জন্য। আমি বাবার বাড়িতে কিছু বলতাম না ।কিন্তু আমি না বলায় ওরা আমার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। আমি তবুও বাপের বাড়িতে কিছু বলিনি ।ভাবলাম আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

আমার উপর যতদিন অত্যাচার করছিল ততদিন পর্যন্ত সহ্য করেছিলাম কিন্তু তার সাথে আমার বাচ্চাটার উপরে প্রভাব ফেলছে। সেজন্য আমি নিজেকে শক্ত করলাম।আমার ইচ্ছা ছিল আমি বাড়িতে জানাবো না আমি সংসার করব যত কষ্টই হোক ।কিন্তু আমার বাচ্চার উপর যখন অত্যাচার চলতে থাকে আমি আর সহ্য করতে পারিনি। এরকমই একদিন শারীরিক অত্যাচার চরমে পৌঁছালে এক প্রতিবেশী দাদা আমার বাপের বাড়িতে জানিয়ে দেয়।

খবর পাওয়া মাত্র আমার দাদা আমাকে আনতে যায়।
আমি যে কাপড় পড়ে ছিলাম সেই কাপড়ে দাদার সাথে বাড়ি চলে যাই। প্রায় আড়াই মাস মত আমি আর আসিনি শ্বশুর বাড়িতে। তখন আমার স্বামী আবার ফোন করে বলে, আমার ভুল হয়ে গেছে ফিরে এসো, আমি আর মারবো না এই বলে।
এবার আমি কাজ করবো বসে বসে খাব না ইত্যাদি।

ওর কথায় আমি আর ভুলিনি। আমি বাপের বাড়িতে থেকে যাই ওখানে বাবা-আমাকে একটা সেলাই মেশিন কিনে দেয় ।আমি খুব ছোটবেলা থেকেই বাবার সেলাই মেশিনে আমি কাজ শিখেছিলাম। আমি সেলাই করে যেটুকু রোজকার করি আমার চলে যায় ।আমার স্বপ্ন বাচ্চাকে আমি বড় করব।

যেভাবে শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার আমি পেয়েছি তার থেকে এইভাবে নিজে রোজগার করে স্বনির্ভরশীল হয়ে একা বাঁচা অনেক ভালো ।আমি আর চাই না ওইরকাম শ্বশুরবাড়ি ।সকল মেয়েদের এই কথাই বলব আগে স্বনির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াও ।পরমুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না ।লড়াইটা শুধু আমার একার নয়, সব মেয়েদের লড়াই হোক। শশুর বাড়ি সবার স্বপ্ন হওয়া উচিৎ নয় ।সবার কপালে সুখ থাকে না ।আগে নিজে প্রতিষ্ঠিত হলে তার মধ্যেই স্বপ্ন ও সুখ লুকিয়ে থাকে।

নাই বা হলো আমার শ্বশুর বাড়ি ।আমি নিজে রোজগার করে খাই ।আমার মেয়ে আমার ভবিষ্যৎ। আমিই মেয়ের স্বপ্ন। সকলের কাছে আমার অনুরোধ পড়ে পড়ে মার খাবে না নিজের পায়ে দাঁড়াও।
নিজে আগে প্রতিষ্ঠিত হলে নিজের স্বপ্ন নিজে পূরণ করতে পারো। মুক্তির স্বাদ পাবে তখন ।

কাশীনাথ সাহা

পরম্পরা

অনিন্দ্য ওর বাবাকে আজই বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এলো। বৃদ্ধ বাবা ওদের ছিমছাম ফ্ল্যাটে বড্ড বেমানান। বিশেষত ওর স্ত্রী শুভ্রার সাথে উনার দূরত্বটা ক্রমশই বাড়ছিল।শুভ্রার আচরনে ক্রমশ ফুটে উঠছিল তিক্ততা।
বাড়িতে ঢুকতেই ছেলে ঋজু বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা দাদু কোথায়? অনিন্দ্য সামান্য অপ্রস্তুত হলেও নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, তোমার দাদুর তো বয়স হয়ে গিয়েছিল তাই তাঁকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে এলাম। বেশ তপোবনের মতো পরিবেশ। ওখানে উনি খুব ভালভাবেই থাকবেন।
পঁচিশ বছর পর অনিন্দ্যকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবার পর সেই একই কথাগুলো ঋজু শোনাচ্ছিল তার ছেলে সায়নকে!

অসিতকুমার পাল

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন

রীনা আর অর্ণবের বিয়ে হয়েছিল তিন বছর আগে । রীনার দুর সম্পর্কের এক আত্মীয় অর্ণবের খোঁজ দিয়েছিল, তারপরে দুই পরিবারই একাধিকবার একে অন্যের বাড়িতে গিয়ে আলাপ আলোচনা করে সম্পর্কটা পাকা করেছিল । পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই বিয়েটা সুসম্পন্ন হয়েছে ।

কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই অর্নব বুঝে গেল রীনা আসলে অর্ণবকে নিজের আজ্ঞাবহ করে রাখতে চায় । যে কোন বিষয়েই অর্ণবের মতামতকে কোন মূল্য না রীনা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় । ফলে উজনের মধ্যে প্রতিনিয়ত মতের অমিল হতে লাগল । রীনা অর্ণবের বৃদ্ধা মায়ের আদেশ নির্দেশ অমান্য করত, প্রধানত সেই বিষয়েই রীনার সাথে অর্ণবের ঝগড়া লেগে যেত ।

মাস পাঁচেক আগে একটি সামান্য ঘটনা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে সেটা চরম পর্যায়ে চলে গেল । তারই জেরে রীনা নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিজের বাবার বাড়িতে চলে গেল । অর্ণব তাকে আটকানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও রীনা তাতে কর্নপাত করল না । বাবার বাড়িতে চলে যাওয়ার পরেও অর্ণব তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রীনা স্পষ্টত জানিয়ে দিল সে বিবাহ বিচ্ছেদ চায় । রীনার বাবা মাও মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে মেয়ের ইচ্ছাকেই মেনে নিল ।

অগত্যা অর্ণব মিউচ্যুয়াল ডিভোর্সএ রাজি হয়ে এক আইনজীবীর শরনাপন্ন হল। স্থির হল ওই আইনজীবী মিউচ্যুয়াল ডিভোর্সের আবেদন তৈরি করবে এবং দিন তিনেক পরে সকাল নটায় অর্ণব ও রীনা তার চেম্বারে গিয়ে সেই আবেদনপত্রে সই করবে। রীনা নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট পাঁচেক আগেই আইনজীবীর চেম্বারে উপস্থিত হয়ে গেল। অর্ণব এর একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল বলে সে বাস থেকে নেমে তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে আইনজীবীর চেম্বারে পৌঁছাতে চাইছিল। কিন্তু রাস্তা পার হওয়ার সময়ে সে একটা দ্রুতগামী ম্যাটাডোরএর ধাক্কায় রাস্তার উপরেই পড়ে গেল ।

আশপাশের লোকের চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে আইনজীবীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে রীনা অর্ণবকে রাস্তায় পড়ে ছটপট করতে দেখল। সম্ভবত অর্ণবএর পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল এবং আরো কয়েক জায়গায় চোট লেগেছিল। রীনা দৌড়ে অর্ণবের কাছে এসে কয়েকজন পথচারীর সাহায্যে তাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল , তারপরে একটি খালি ট্যাক্সি থামিয়ে অর্ণবকে একটা হাসপাতালে নিয়ে গেল।

পরীক্ষা করে দেখা গেল অর্ণবের ডান পায়ের একটি হাড় ভেঙ্গেছে , তবে অন্য জায়গার চোট গুলো ততটা মারাত্মক নয়। পায়ে প্লাস্টার করা ও অন্য চিকিৎসার জন্য অর্ণবকে দিনকয়েক হাসপাতালে থাকতে হল। রীনা অর্ণবের বাড়িতে খবর পাঠাল সেইসঙ্গে ডাক্তারের সাথে আলোচনা ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা রীনাই করল। হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার পরে রীনাই অর্ণবকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করল , অর্ণবের বাড়িতে থেকেই সে তার সেবাযত্ন করতে লাগল।

যে রীনা কিছুদিন আগেও অর্ণবের থেকে বিচ্ছেদ চাইছিল সেই এখন অসুস্থ স্বামীর সেবাযত্ন করছে দেখে তার বাবামা আশ্চর্য হয়ে গেল। তার প্রতি রীনার আচরনের পরিবর্তন দেখে অর্নবও যথেষ্ট অবাক হল। সপ্তাহ কয়েক পরে অর্ণবের পায়ের প্লাস্টার কেটে দেওয়া হল , তারপরে অর্ণব ধীরেধীরে হাঁটাচলা করতেও শুরু করল। রীনা কিন্তু বাবার বাড়িতে আর ফিরে গেল না , বিবাহ বিচ্ছেদের কথাও তুলল না। এছাড়া অর্ণবের মায়ের প্রতি রীনার বিরাগ ভাবটাও চলে গিয়েছিল , সেই সঙ্গে অর্ণবের উপরে নিজের মতামত জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাটাও ছিল।

এক কথায় অর্নবের দুর্ঘটনা রীনার আচার আচরনকে সম্পূর্ন বদলে দিয়েছিল।

গ্রন্থ আলোচনা

ভবানীশংকর চক্রবর্তী

কবিতার স্বরান্তর

কখনও কখনও কবিতার স্বরান্তর পাঠককে যুগপৎ চমকিত ও মুগ্ধ করে।অমল করের ' ভেঙে যাচ্ছে চাঁদ ' কাব্যগ্রন্থটি পড়তে পড়তে পাঠকের এমন অনুভব হওয়ারই কথা। গ্রন্থটিতে ছাপ্পান্নটি কবিতা আছে। প্রতিটি কবিতাই স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এবং প্রতিটি কবিতা পাঠের শেষে পাঠকের মনে হবে যেন অন্য স্বর কানে বাজে।অমল আদ্যন্ত মার্ক্সবাদী এবং স্বভাবতই সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি কবিতা নির্মাণে প্রয়াসী। তাঁর শব্দচয়ন,বাকবিন্যাস,উপমার ব্যবহার সবকিছুর মধ্যে তিনি তাঁর দ্রোহকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেন যেন মনে হয় সমগ্র কবিতার ভেতর থেকে থেকে অন্য স্বর উঠে আসে। সেই স্বর দৃপ্ত,ঋজু এবং সহজ। দুয়েকটি কবিতার পঙক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে।

১। শুধু অশ্রু নয় আগুনও রয়েছে দুচোখে/শরীর নয় খুলে দেখা তোর দুর্মর সাহস
(পদতলে জমি করতলে আকাশ)
২। বিসুভিয়াসের মতো সুপ্ত মানুষ জীবনের টানে/জাগছে জেগে উঠছে শেষবেলার গানে
(জাগছে সুপ্ত মানুষ)
এরকম অজস্র চরণ উদ্ধার করা যায়।
মুক্তিরাম মাইতির প্রচ্ছদ গভীর অর্থবহ এবং অবশ্যই সুন্দর। কাগজ,ছাপা ও বাঁধাই বেশ ভালোই। কবিতায় যাঁরা অন্য স্বর শুনতে ভালোবাসেন তাঁদের কাছে বইটি অবশ্যই আদৃত হবে।

ভেঙে যাচ্ছে চাঁদ
অমল কর
সারঙগ প্রকাশনী, হাওড়া
দাম: একশো টাকা

CHITROKTI PORIKA

ছোটোদের বিভাগ - আঁকিবুকি

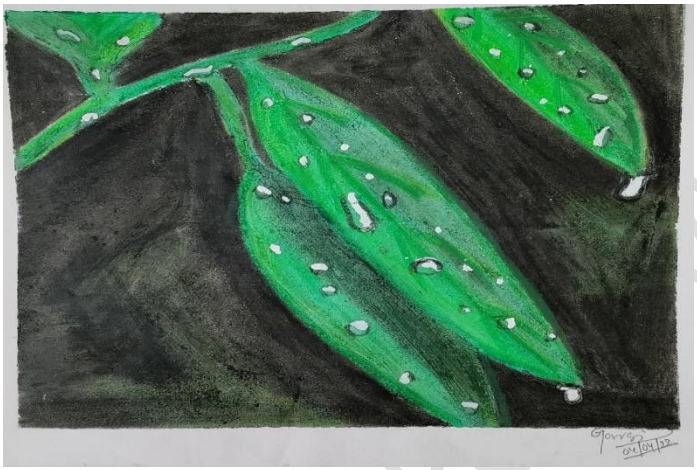

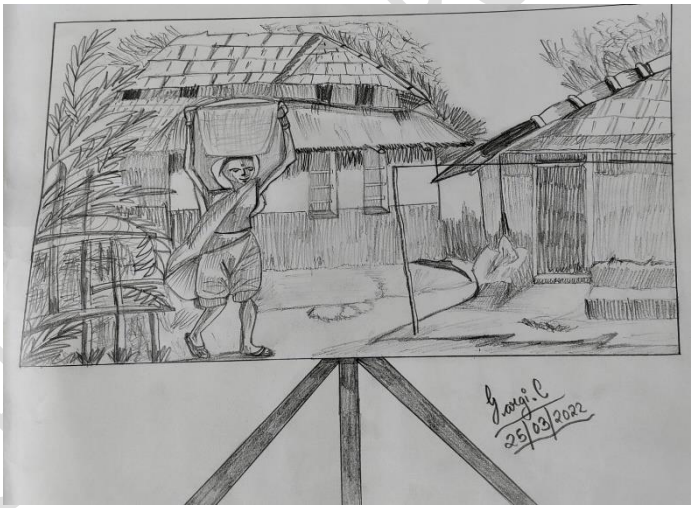

পরিকল্পনা - লোপামুদ্রা, প্রচ্ছদ - গার্গী, সম্পাদনা - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ন - চৈতন্য (হায়দ্রাবাদ)

"CHITROKTI" online quarterly Little Magazine published by Subhra Kanti Chattopadhyay from Anandamoyee Apartment, Bose Para Road, Barisha, Kolkata-700008, Designed by Chaithanya K, Hyderabad.
1st Year 2nd Issue, Baishakhi Sankhya, Online, April - May 2022.